হব্‌সের রাষ্ট্রদর্শন (Background)

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে হব্‌সের রাষ্ট্রদর্শন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। হব্‌সের রাষ্ট্রদর্শন তাঁর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রদর্শনকে বিচারবিশ্লেষণ করে এক ব্যাপক রাষ্ট্রচিন্তা উপস্থাপন করেন। সেজন্য তাঁর তত্ত্বকে শাশ্বত বা চিরকালীন তত্ত্ব বলে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **অমল কুমার মুখোপাধ্যায়** যথার্থই বলেছেন যে, অ্যারিস্টট্‌লের পর রাষ্ট্রচিন্তার মৌলিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিল। তিনিই হলেন আধুনিককালের প্রথম চিন্তাবিদ, যিনি যুক্তিবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। **ডানিং**-এর মতে রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রাচীন ও পরিচিত ধারণাগুলি হব্‌সের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুনভাবে গুরুত্ব লাভ করে এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মানুষের কাছে রাষ্ট্র ও সরকার কেন প্রয়োজন, কীসের ভিত্তিতে তারা কার্য সম্পাদন করে, মানুষকে কেন তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদান করতে হয় প্রভৃতি মৌলিক বিষয় হব্‌সের রাষ্ট্রদর্শনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তুত, আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের সমগ্র কাঠামোটিই তাঁর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী বিশ্লেষণে সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের বিকাশ

মানবপ্রকৃতি (Human Nature)

হব্‌সের রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম দিক হল মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে রাজনীতি-বিজ্ঞান গড়ে তোলা।[৮] হব্‌স অ্যারিস্টট্‌লের মতো পরম লক্ষ্যের ধারণা নিয়ে বা মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদদের মতো ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে মানুষের আচরণকে বিশ্লেষণ করেননি। বরং, ম্যাকিয়াভেলির মতো মানবপ্রকৃতির ধর্মনিরপেক্ষ উৎসের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষকে তিনি যেমন দেখেছেন, সেভাবেই চিত্রিত করেছেন। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রদর্শন প্রচ্ছন্ন ছিল। **হব্‌সের** মতে, বিশ্বের যে-কোনো বস্তুর মতো মানুষও হল গতিশীল বস্তু। মানবজীবনকে যা-কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, তা-ই পরিণাম নয়। তা হল কারণ মাত্র। এটিই হল মানুষের মনস্তাত্ত্বিক কৃৎকৌশল। হব্‌সের কাছে মানুষ নিছক যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাদের একসঙ্গে বসবাসের ফলে যে-সমাজের উদ্ভব হয়, তা হল তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। সুতরাং মানুষের সমাজও হল এমন একটি বৃহত্তর যন্ত্র, যা একমাত্র প্রকৃতির নিয়মেরই অধীন। বস্তুত, হব্‌স মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন।

মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ

লেভিয়াথান-এর প্রথম খণ্ডের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়েই রয়েছে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে হব্‌সের বিশ্লেষণ। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে দুটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় বলে বস্তুবাদী চিন্তাবিদ হব্‌স

Scanned with CamScanner

মনে করতেন। একটি হল আকাঙ্ক্ষা (appetite) এবং অন্যটি হল আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি অনীহা বা বিতৃষ্ণা (aversion)। **হব্‌সের** মতে, ব্যক্তি যেহেতু গতির নিয়মে ক্রিয়াশীল, সেহেতু এর থেকেই সব মানসিক ও নৈতিক ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। ভালোমন্দ সম্বন্ধে ধারণা বা মানুষের ইচ্ছা গতির নিয়মে পরিচালিত হয়। আমরা যা অধিগত করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, তা হল 'ভালো' এবং যা করা থেকে বিরত থাকি, তা হল 'মন্দ'। **হব্‌স** বলেছেন যে, এই আকাঙ্ক্ষা এবং বিতৃষ্ণার ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে-ওঠা গতিপ্রবাহের ধারাই হল মানবপ্রকৃতি।[৯] তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী মানুষের ইচ্ছা এক অমোঘ নিয়মের অধীন। নিজের ইচ্ছার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হল—ভালোমন্দের গুণাগুণ বস্তুর মধ্যে নেই। মানুষের চেতনায় বস্তুকণার আঘাতে যে-মনোভাব সৃষ্টি হয়, ভালোমন্দের ধারণা তা থেকেই আসে। ভালোমন্দ সম্পর্কে ধারণা সব সময় একই হতে পারে না। চিরন্তন ভালো বা চিরন্তন মন্দ বলে কিছু থাকতে পারে না। যা মানুষকে আকর্ষণ করে, তা-ই ভালো এবং তার প্রতিই মানুষ বেশি আকৃষ্ট হয়। আবার, যা মানুষকে বিকর্ষণ করে, তা থেকে সে নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভালোমন্দ বোধের মধ্যেও তারতম্য দেখা দেয়।

ভালোমন্দ বোধ সম্পর্কিত আলোচনা

হব্‌সের মতে, মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু আয়ত্তাধীনে আনার মাধ্যমেই সুখ লাভ হয়। মানুষ এই সুখলাভের তাগিদে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ম্যাকিয়াভেলির মতো তিনিও মনে করতেন যে, সুখলাভের হাতিয়ার হল 'ক্ষমতা'। মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হল অবিশ্রান্ত ক্ষমতালিপ্সা। এই ক্ষমতা অর্জনের বাসনা চিরন্তন এবং একমাত্র জীবনাবসানে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।[১০] তিনি ক্ষমতাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'ক্ষমতা' বলতে তিনি কেবল প্রাধান্যকেই বোঝাতে চাননি, সেই সঙ্গে সম্পদ, সৌভাগ্য ও বন্ধুদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সব মানুষের ইচ্ছার লক্ষ্য হল ক্ষমতা। তিনি বলেন যে, সম্পদ, ক্ষমতা বা মর্যাদাভিত্তিক ব্যবধান মানুষের প্রকৃতিগত ব্যবধান নয়। তাঁর মতে, মানুষে মানুষে কলহ, সংঘাত ও বৈষম্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে তিনটি কারণ। এগুলি হল—[১] অভিন্ন বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা, [২] অবিশ্বাস ও সংশয় এবং [৩] শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রত্যেকের অদম্য ইচ্ছা। প্রথম কারণে অভীষ্ট লাভের উদ্দেশে একে অপরকে আক্রমণ করে। দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সংশয়হেতু নিরাপত্তার প্রয়োজনে কলহবিবাদ সৃষ্টি হয় এবং তৃতীয় কারণে অর্থাৎ সম্মানলাভের উদ্দেশে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পদানত করার চেষ্টা করে। এইভাবে প্রত্যেক মানুষ ভয়ের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে। ক্ষমতা সম্পর্কে হব্‌সের অভিমত ম্যাকিয়াভেলির অভিমত থেকে পৃথক ছিল। হব্‌সের মতে, কেবল কয়েকজন রাজনৈতিক এলিটেরই নয়, সব মানুষেরই লক্ষ্য হল ক্ষমতালাভ।

ক্ষমতা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ

মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে হব্‌সের ধারণার অন্যতম দিক হল—তিনি প্রকৃতিগত দিক থেকে সব মানুষকেই সমান বলে মনে করতেন। এক্ষেত্রে তিনি অ্যারিস্টটলীয় ঐতিহ্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। অ্যারিস্টটলের মতো তিনি এ কথা বলেননি যে, মানুষ জন্মগতভাবে শাসক বা দাস। সাম্য বলতে **হব্‌স** বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শারীরিক ও মানসিক কর্মশক্তির দিক থেকে সব মানুষই সমান। তিনি স্বীকার করতেন যে, শরীর ও মনের দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের আপাতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে তা হল সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। কারণ, কৌশলে কিংবা অপরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শারীরিক দিক থেকে সবথেকে দুর্বল ব্যক্তিও সর্বাপেক্ষা বলবানকে আঘাত করতে পারে। **হব্‌স** মনে করতেন যে, যেহেতু সব মানুষই সমান এবং সবাই একই জিনিস পেতে চায়, সেহেতু এর থেকে মতবিরোধ, সংঘর্ষ, শত্রুতা এবং কলহের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি মানুষই তার নিরাপত্তা বা ক্ষমতা-সংক্রান্ত উদ্যোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সবাই মোটামুটিভাবে সমান শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী হওয়ায় কেউই নিরাপত্তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারে না। তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো বৈধ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্য একজনের সংঘর্ষ চলতে থাকে। যারা জয়লাভ করে, তারা আরও বেশি শত্রুতা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। **হব্‌সের** মতে, অপরের সঙ্গে থেকে মানুষ কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ করে না। সম্মান, সম্পদ ও কর্তৃত্বের জন্য মানুষ স্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

সাম্য সম্পর্কে হব্‌সের ধারণা

মানবপ্রকৃতিকে হব্‌স যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন এবং মানুষের স্বভাব, সমস্যা ও প্রত্যাশার যে-চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, তা তাঁর পূর্বে অন্য কেউ উপস্থাপন করতে পারেননি। ম্যাকিয়াভেলি-ও মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু তা হব্‌সের মতো এতটা নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত ছিল না। সি.বি. ম্যাকফারসন (C.B. Macpherson) তাঁর *দ্য পলিটিক্যাল থিওরি অব্ পজেসিভ ইন্ডিভিদুয়ালিজম্ : হব্‌স টু লক্ (The Political Theory of Possessive Individualism : Hobbes to Locke)* নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, মানুষ সম্পর্কে হব্‌সের বিশ্লেষণ যেন আজকের অর্থাৎ, বর্তমান সমাজের মানুষেরই মনোভাবকে প্রকাশ করেছে। হব্‌স প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যে-মনোভাব বিশ্লেষণ করেছেন, তাকে নিছক আদিম মানুষের মনোভাব হিসেবে দেখা চলে না। এ মানুষ ছিল সমকালের সভ্য মানুষ। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হব্‌স বলেছেন যে, প্রতিযোগিতা, অবিশ্বাস ও গৌরব—প্রকৃতির রাজ্যে এই তিনটি বিষয়ই মানুষকে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। আধুনিক সভ্য সমাজেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সভ্য সমাজের মানুষও ভালোভাবে বাঁচার তাগিদে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং পরস্পরকে অবিশ্বাস করে। গৌরবের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের মধ্যে স্পষ্টভাবেই বর্তমান রয়েছে।

মূল্যায়ন

প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature)

মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে হব্‌স প্রকৃতির রাজ্য-সংক্রান্ত ধারণাটি তুলে ধরেছেন। নৈরাশ্যবাদী ও মলিন মানবপ্রকৃতির আলোকে প্রকৃতির রাজ্যের যে-চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, তাতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল জঘন্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকৃতির রাজ্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যের ধারণা একটি কাল্পনিক তাত্ত্বিক নির্মাণ ছাড়া আর কিছু নয়। রাষ্ট্র বা রাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটিকে অপরিহার্য বলেই হব্‌স মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃতির রাজ্য হল একটি যৌক্তিক নির্মাণ, একটি পদ্ধতিগত অনুকল্প। তিনি মনে করতেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে মানুষের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রকৃতির রাজ্যের একটি অনুকল্প তৈরি করেছিলেন।

জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতির প্রয়োগ

হব্‌সের মতে, প্রকৃতির রাজ্য ছিল **প্রাক্-সামাজিক** এবং **প্রাক্-রাজনৈতিক**। এখানে মানুষের জীবন ভয়াবহ ও অসহনীয় ছিল। ওই অবস্থায় মানুষ যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হত না; ক্ষুধা, আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে সে কাজ করত। প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় মানুষ ছিল হিংস্র ও স্বার্থপর। তাঁর মতে, প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ বলে কিছু ছিল না। মানুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাব ও কলহপ্রিয়তা জঙ্গলের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। মানুষ যা কিছু করত, তা ক্ষমতা লাভের জন্যই করত। প্রকৃতির রাজ্যে যা ছিল না, তা হল বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা। হব্‌সের বর্ণনা অনুযায়ী ওই অবস্থায় শিল্প, সংস্কৃতি, কলা, ব্যাবসাবাণিজ্য প্রভৃতির কোনো রকম উন্নতিই সম্ভব ছিল না। তখন কেবল পারস্পরিক অবিশ্বাস, শত্রুতা ও হানাহানি মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাঁর ভাষায়, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল 'নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং স্বল্পস্থায়ী'।[১১]

প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা

প্রকৃতির রাজ্যের নৈরাশ্যজনক অবস্থার যে-চিত্র **হব্‌স** এঁকেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, ওই অবস্থা বর্ণনার নেপথ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের পিউরিটান বিপ্লবজনিত ভীতি এবং ক্রমওয়েলীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস কাজ করেছে। তবে প্রকৃতির রাজ্যের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। এটি ছিল তাঁর অনুমিত প্রকল্প। তিনি তাঁর কোনো সিদ্ধান্তকে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখেননি। যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রাকৃতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন মাত্র। তাঁর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে কেবল রাষ্ট্র বা সরকার ছিল না তা-ই নয়, প্রকৃত সমাজজীবনেরও কোনো চিহ্ন ছিল না। তাই তিনি সামাজিক শৃঙ্খলাবহির্ভূত মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। হব্‌স-বর্ণিত প্রকৃতির রাজ্যের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিতভাবেই প্রশ্ন তোলা যেতে

যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি

Scanned with CamScanner

পারে। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষের প্রকৃতিই তাকে প্রকৃতির রাজ্যের অসহনীয় অবস্থায় উপনীত করেছিল। কারণ, মনুষ্য-প্রকৃতি এমন যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মানুষের জীবন হব্‌স-বর্ণিত দুঃসহ জীবনে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। বস্তুত, সার্বভৌমের কর্তৃত্ববিহীন অবস্থায় প্রতিটি সমাজ বা জাতিই প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বিরাজমান ছিল।[১২]

প্রাকৃতিক আইন (Laws of Nature)

মানবপ্রকৃতি ও প্রকৃতির রাজ্য-সংক্রান্ত অনুমিত ধারণা থেকে অবরোহমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে হব্‌স প্রাকৃতিক আইন-সংক্রান্ত ধারণা উপস্থাপন করেছেন। প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে তাঁর ধারণা পূর্বেকার প্রাকৃতিক আইনের ধারণা থেকে পৃথক। প্রাচীন স্টোয়িক দার্শনিকরা প্রাকৃতিক আইন বলতে এমন কতকগুলি চিরন্তন অভ্রান্ত নৈতিক বিধিকে বুঝতেন, যার অসম্পূর্ণ প্রকাশ হল বাস্তব আইন।[১৩] মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় ওই ধারণাকে ঐশ্বরিক নির্দেশরূপে গণ্য করা হত। ওই ধারণা অনুযায়ী প্রাকৃতিক আইনকে বাস্তব আইনের বিশুদ্ধতা পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে দেখা হত। এইভাবে চিরাচরিত ধারণায় বাস্তব আইনকে প্রাকৃতিক আইন বা নৈতিক আইনের ওপর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু হব্‌সের প্রাকৃতিক আইন হল কতকগুলি বিবেচনাপূর্ণ পরামর্শ। তাঁর মতে, নৈতিক অধিকার বলে কিছু নেই। কোনো ব্যক্তির কর্তব্য এবং স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। 'জনমঙ্গল' বলে কোনো ধারণা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গলসাধনের জন্য কতকগুলি সাধারণ শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়। **হব্‌সের** মতে, ক্ষমতা লিপ্সা এবং মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সব মানুষেরই অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা থাকে। আত্মরক্ষার তাগিদ সকলেরই থাকে এবং সবাই মৃত্যু পরিহার করতে চায়। তাঁর মতে, সব মানুষই এ বিষয়ে একমত যে, শান্তি ও আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। এই নিয়মগুলিই হল প্রাকৃতিক আইন। এগুলিকে তিনি 'শান্তির অনুচ্ছেদ' (Articles of Peace) বলে চিহ্নিত করেছেন।

দু-ধরনের প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য

সুতরাং, **হব্‌সের** মতে, প্রাকৃতিক আইন হল যুক্তির নির্দেশ এবং তা আত্মসংরক্ষণের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের সমষ্টি। তিনি বলেছেন যে, প্রাকৃতিক আইন হল যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেইসব নীতি, যেগুলি জীবনকে ধ্বংস করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং আত্মরক্ষায় তাদের উৎসাহিত করে।[১৪] হব্‌স মনে করতেন যে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ও সংঘাতপূর্ণ অনিশ্চিত জীবন প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ওই প্রাকৃতিক আইন ছিল এমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নীতি, যেগুলির দ্বারা হব্‌সের যুক্তিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। বোদাঁ ও গ্রোটিয়াস প্রাকৃতিক আইনকে নৈতিক আইন হিসেবে দেখেছেন। এরূপ আইন ভালো কাজ করতে যেমন উৎসাহ দেয়, তেমনি খারাপ কাজ পরিহার করতে বাধ্য করে। **হব্‌সের** মতে, আইন হল সার্বভৌমের আদেশ। প্রাকৃতিক আইন যেহেতু সার্বভৌমের আদেশ নয়, সেহেতু তা প্রকৃতপক্ষে আইন নয়। তিনি মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক আইন হল এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত ও নীতি, যেগুলি মানুষের কল্যাণসাধন করে। এগুলি অমান্য করে মানুষ তার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয়। বস্তুবাদী হব্‌স উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক আইনের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। মানুষ নৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য ওই আইন মেনে চলে না। এর দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হয় বলেই সে তাকে মান্য করে। হব্‌স ১৯টি প্রাকৃতিক আইনের উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে তিনটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম আইনটি হল শান্তির অন্বেষণ এবং অনুসরণ। এর মূল কথা হল—যতদূর পর্যন্ত কোনো মানুষের শান্তিলাভের আশা থাকে, ততদূর পর্যন্ত সে শান্তির জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু যখন তা সে পায় না, তখন সংগ্রামের পথে পা বাড়ায়। হব্‌সের প্রাকৃতিক আইনের দ্বিতীয় সূত্রটি হল স্বাভাবিক অধিকার ত্যাগ করার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা। এই সূত্রটির মূল কথা হল—শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার জন্য অপরেও যখন ইচ্ছুক থাকে, তখন তার বিরুদ্ধে যথেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করে শুধু সেইটুকু স্বাধীনতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, যেটুকু সে অপরকে ভোগ করতে দেবে। প্রাকৃতিক আইনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে এবং তা মেনে চলে। পারস্পরিক অধিকার হস্তান্তরই হল চুক্তির বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার ভিত্তি হল সেই পারস্পরিক বিশ্বাস, যার মাধ্যমে প্রত্যেকে চুক্তি মেনে চলে।

প্রাকৃতিক আইনের সংজ্ঞা

প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে হব্‌সের ধারণার মূল্যায়ন মূলত দুটি দিক থেকে করা যেতে পারে। **প্রথমত,** হব্‌সের প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত ধারণায় এমন এক স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়, যার ফলে এই আইন সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে গেছে। প্রথমে তিনি মানুষের অহংসর্বস্ব আবেগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরে মানুষের এই আবেগকে তার যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি চুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত, তিনি উপযোগিতার ভিত্তিতেই প্রাকৃতিক আইনকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যের অন্ধকারময় অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি প্রাকৃতিক আইনকে পাশবিক আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আবার, শান্তি ও আত্মরক্ষার তাগিদের কথা বলতে গিয়ে হব্‌স ওই আইনকে যুক্তির নির্দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। তাই অনেকে মনে করেন যে, এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের সমন্বয়সাধনে তিনি সফল হতে পারেননি। **দ্বিতীয়ত,** অনেকে এই মন্তব্যও করেছেন যে, হব্‌স-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ না-থাকা সত্ত্বেও কী করে মানুষ প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থেকে যায়। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বৈজ্ঞানিক নীতির ওপর ভিত্তি করে তিনি যে-দর্শন গড়ে তোলেন, প্রাকৃতিক আইন ছিল তারই অংশবিশেষ। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক আইন এমন কতকগুলি অনুমানসিদ্ধ শর্তের নির্দেশ দান করে, যেগুলির ভিত্তিতে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মানুষের উদ্দেশ্য।

মূল্যায়ন

প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights)

হব্‌স বলেছেন যে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যে-অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করত, তার মূল কারণ ছিল এই যে, তখন মানুষ প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত। ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা বা যথেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতাই প্রাকৃতিক অধিকার। হব্‌সের মতে, প্রাকৃতিক অধিকার হল আত্ম-সংরক্ষণের প্রয়োজনে ব্যক্তির যে-কোনো কাজ করার স্বাধীনতা। এরূপ অধিকারের অবাধ প্রয়োগের সুযোগ নিয়ে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের সুখসমৃদ্ধি, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য পারস্পরিক বিবাদে প্রায়শই লিপ্ত থাকত। তাঁর মতে, বাইরের প্রতিবন্ধকতা মানুষের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। তাই সে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে চায়। হব্‌স যখন প্রাকৃতিক অধিকারের কথা বলেছেন, তখন তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের নৈতিক অধিকার বলে কিছুই নেই। একমাত্র পাশবিক শক্তিই মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

প্রাকৃতিক অধিকারের সংজ্ঞা

হব্‌স প্রাকৃতিক অধিকার এবং প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। **প্রথমত,** এই দুটিই হল মানুষের আত্মরক্ষার উপায়। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন যুক্তির নির্দেশ হওয়ার ফলে তা হল সংহতিমূলক উপায়। অপরদিকে, প্রাকৃতিক অধিকার ব্যক্তির স্বার্থবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তাকে হব্‌স ধ্বংসমূলক উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। **দ্বিতীয়ত,** প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে কর্তব্যের ধারণা যুক্ত থাকে। কারণ, আত্মরক্ষার জন্য মানুষ কতকগুলি প্রাকৃতিক অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, যার ফলে সে ক্ষমতাগুলি নিশ্চিতভাবে ভোগ করতে পারে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক অধিকারের সঙ্গে স্বাধীনতা জড়িয়ে থাকে, এর ফলে মানুষ প্রাকৃতিক অধিকার অবাধ প্রয়োগের সুযোগলাভ করত। **তৃতীয়ত,** প্রত্যেক মানুষের সমান প্রাকৃতিক অধিকার তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। এর ফলে প্রকৃতির রাজ্য অবিরাম সংগ্রামের রাজ্যে পরিণত হয়। একে অন্যের সঙ্গে কলহবিবাদে মেতে ওঠে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক আইন ছিল যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এমন নীতি, যার সাহায্যে মানুষ সংঘর্ষের রাজত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ গড়ে তোলে।

প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য

হব্‌স তাঁর প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তিনি যে-সমন্বয়ের কথা বলেছেন, তা বাস্তবে অসম্ভব। তবে তাঁর প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ গঠনের মূলে ছিল সব ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা এবং ব্যক্তিমানুষের নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা। **স্যাবাইন** যথার্থই বলেছেন যে, এই সুস্পষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতাই হব্‌সের মতবাদকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবাত্মক মতবাদে উন্নীত করেছে।

মূল্যায়ন

Scanned with CamScanner

সামাজিক চুক্তি ও রাষ্ট্রের ভিত্তি (Social Contract and Basis of the State)

মানবপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক অধিকার এবং প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে প্রাথমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর হব্‌স রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে বিদ্যমান যুক্তি ও চুক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তাঁর চুক্তি-তত্ত্ব পূর্বের চুক্তি-তত্ত্ব থেকে পৃথক। পূর্বের তত্ত্ব অনুযায়ী চুক্তি হয়েছিল শাসক ও শাসিতের মধ্যে। কিন্তু হব্‌স-বর্ণিত চুক্তি ছিল সামাজিক চুক্তি এবং এই চুক্তি হয়েছিল জনগণের নিজেদের মধ্যে। এরদ্বারা জনসমাজ সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। *ওল্ড টেস্টামেন্ট*, রোমান আইন বা ষোড়শ শতাব্দীর রাজতন্ত্রবিরোধী চিন্তাধারায় যে-চুক্তির উল্লেখ রয়েছে, তাতে শাসকের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। প্রাক্-হব্‌সীয় চুক্তিবাদে শাসক ও প্রজা উভয়কেই তাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকার কথা বলা হয়েছে। এই তত্ত্বের সাহায্যেই মিলটন প্রথম চার্লসের হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন। চুক্তি সম্পর্কে সনাতন ধারণার ত্রুটি সম্বন্ধে হব্‌স অবহিত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, চুক্তির শর্ত মেনে চলা সম্পর্কে নিশ্চয়তা না থাকলে চুক্তি কার্যকর হতে পারে না। তাই তিনি রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তি সম্পাদন অসম্ভব বলে মনে করতেন। কারণ, এক্ষেত্রে রাজা, না প্রজা—কে চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তা নির্ধারণের জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ ছিল না। কিন্তু হব্‌স যে-চুক্তির কথা বলেছেন, তা সম্পাদিত হয়েছিল জনগণের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের। এরই ফল হিসেবে কমনওয়েল্‌থ্ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই কমনওয়েল্‌থ্ বা সার্বভৌম শক্তি হল তৃতীয় পক্ষ। প্রকৃতির রাজ্যের সব মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে সার্বভৌম শক্তি বা কমনওয়েল্‌থের হাতে তাদের যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছিল।

প্রাক্-হব্‌সীয় ও হব্‌সীয় চুক্তি তত্ত্ব

হব্‌সের মতে, [১] অর্জিত এবং [২] প্রতিষ্ঠানগত—এই দু-রকম পদ্ধতিতে কমনওয়েল্‌থ্ বা রাষ্ট্রের উৎপত্তি হতে পারে। যখন কোনো উচ্চতর শক্তি ভয় দেখিয়ে জনগণকে বশীভূত করে, তখন আত্মবিনাশের ভয়ে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে। একে তিনি বলেছেন অর্জিত পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন। আবার, মানুষের আবেগ তাকে তার অন্তর্নিহিত শান্তিকামী যুক্তির অনুগামী করে তোলে। নিজেকে অন্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে—এই বিশ্বাসে ব্যক্তি তার সব ক্ষমতা চুক্তির মাধ্যমে কোনো তৃতীয় পক্ষের হাতে অর্পণ করে। **হব্‌সের** মতে, এই পদ্ধতি হল এমন একটি প্রতিষ্ঠানগত পদ্ধতি, যারদ্বারা সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই দুটি পদ্ধতিই চুক্তিগত পদ্ধতি হলেও প্রতিষ্ঠানগত পদ্ধতির মধ্যেই চুক্তির সারবস্তু নিহিত থাকে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে, ক্ষমতা এবং গৌরবের মোহ মানুষকে চুক্তি সম্পাদন করতে অনুপ্রাণিত করেনি। মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তিই তাকে এই সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল যে, যুদ্ধবিগ্রহ থেকে শান্তিই মানুষের জীবনে অধিক কাম্য। কারণ, শান্তিই দুঃখকষ্ট হ্রাসের মাধ্যমে সুখকে ত্বরান্বিত করে। মৃত্যু-ভয় মানুষকে শান্তিকামী ও যুক্তির অনুগামী করে তোলে। বস্তুত, শান্তি ও নিরাপদ অস্তিত্বের তাগিদেই মানুষ একে অপরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে চুক্তির মাধ্যমে সুসংহত সমাজ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এর ফলে সকলেরদ্বারা সৃষ্ট হল এক বৃহত্তর ভীতিজনক বস্তু, যা সার্বভৌম শক্তি নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির দু-ধরনের প্রক্রিয়া

হব্‌স বলেছেন যে, সকলের ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক অধিকার বর্জন সমানভাবে বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। যে-চুক্তির ফলে কমনওয়েল্‌থ বা রাষ্ট্র তৈরি হল, তাতে প্রত্যেক সদস্যই প্রত্যেকের সঙ্গে একই ভাষায় একইভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তারা প্রত্যেকে এই কথা বলে চুক্তি করেছিল, "আমি আমার নিজের শাসন করার সব অধিকার ত্যাগ করে এই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হাতে তা এই শর্তে অর্পণ করছি যে, তুমিও তোমার সব অধিকার তাকে অর্পণ করবে এবং অনুরূপভাবে তাকে যাবতীয় কার্যের কর্তৃত্ব প্রদান করবে।"[১৫] এইভাবে জন্মলাভ করে বিশাল লেভিয়াথান। **হব্‌স** একে শ্রদ্ধাভরে এমন এক 'মরণশীল দেবতা' বলেছেন, যিনি অমর ঈশ্বরের ছত্রছায়ায় সকলের শান্তি ও নিরাপত্তার নিয়ন্তা হিসেবে কার্য সম্পাদন করবেন। এইভাবে রাষ্ট্র গঠিত হয়। সার্বভৌম শক্তির উদ্ভবের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থা অন্তর্হিত হয় এবং সমাজজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হল।

চুক্তি ও তার ফল

হব্‌সের অভিমত বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও সামাজিক চুক্তির প্রকৃতিগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা **ডানিং** উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত**, মানুষ কখন চুক্তি সম্পাদন করে, তখন সার্বভৌমের কোনো উপস্থিতি সেখানে ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যে-সমতা ভোগ করত, সেই সমতার ভিত্তিতেই তারা চুক্তি সম্পাদন করেছে। চুক্তির পরিণতি হিসেবে সার্বভৌমের আবির্ভাব ঘটেছে। চুক্তির অঙ্গে সার্বভৌমের অস্তিত্ব ছিল না। সার্বভৌম চুক্তির অঙ্গীভূত হননি, তিনি ছিলেন চুক্তির ঊর্ধ্বে। জনগণ নিজেরাই নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে সার্বভৌম শক্তি সৃষ্টি করেছিল। **দ্বিতীয়ত**, চুক্তিতে যারা অংশগ্রহণ করেনি, সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষ সার্বভৌমের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতা কার হাতে অর্পণ করা হবে, এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামত প্রাধান্য পেয়েছিল এবং তা চুক্তির অংশে পরিণত হয়েছিল। **তৃতীয়ত**, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনেই চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল এবং এটিও ছিল চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করার জন্যই সার্বভৌম সংস্থাকে অসীম ক্ষমতা এবং অবাধ ও স্বেচ্ছাধীন কার্যকলাপের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা হয়।[১৬] **পরিশেষে** বলা যেতে পারে যে, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, সার্বভৌম তার অধীনে থাকা সব মানুষের ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে। এই চুক্তির মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রকৃতির রাজ্যের সব মানুষের অধিকার চূড়ান্তভাবে সমর্পিত হয়, অপরদিকে তেমনি সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

চুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে হব্‌সের বক্তব্যের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সমালোচনা করা হয়ে থাকে। [১] হব্‌স-বর্ণিত প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল বন্য, হিংস্র, সংঘাতপ্রবণ, রুক্ষ ও হৃদয়হীন। অথচ সেই মানুষ হঠাৎ যুক্তিপ্রবণ, বিচার-বোধসম্পন্ন এবং উন্নত আইনগত চেতনার অধিকারী হয়ে উঠে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে—এ কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। তাই অনেকের মতে, তাঁর বক্তব্য অযৌক্তিক এবং কোনোভাবেই তা মেনে নেওয়া যায় না।

মূল্যায়ন

[২] সাধারণত সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার আইনগত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশেই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব। কিন্তু হব্‌সের মতে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পূর্বেই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এরূপ ঘটনাকে ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়ার সামনে গাড়ি রাখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। আর সেজন্যই হব্‌সের বক্তব্যকে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলে সমালোচনা করা হয়।

[৩] সামাজিক চুক্তি-সংক্রান্ত হব্‌সের ধারণায় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে চুক্তির ঊর্ধ্বে রেখে তাকে অবাধ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করে তোলা হয়েছে। অনেকের মতে, নিজেদের মধ্যে চুক্তি সীমাবদ্ধ রেখে এবং চুক্তির ঊর্ধ্বে এক অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগকারী মানুষ আরও ভয়ংকর অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। এরদ্বারা হব্‌স রাষ্ট্রীয় চরমতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

হব্‌স প্রকৃতির রাজ্যের কথা কল্পনা করে যে-কাল্পনিক চুক্তির অবতারণা করেছেন, তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সমালোচনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাই এইসব সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর উত্তর হল—প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের কাছে একটিই বিকল্প ছিল, হয় মহাশক্তিশালী সার্বভৌমের কাছে নিজেদের সমর্পণ করা, নতুবা প্রকৃতির রাজ্যের দুঃসহ, অরাজক অবস্থাকে আরও খারাপ হতে দেওয়া। বস্তুত, সামাজিক চুক্তি-সংক্রান্ত হব্‌সের ধারণার গুরুত্বকে কোনোমতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর চুক্তিবাদের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবে চুক্তি-সংক্রান্ত ধারণা উপস্থাপন করেছেন। তা ছাড়া, **স্যাবাইন** হব্‌সকে উপযোগিতাবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ, **হব্‌সের** মতে, ব্যক্তিস্বার্থই হল মানুষের সর্বপ্রকার আচরণের প্রেরণা। তাই সমাজকে এই লক্ষ্যসাধনের উপায় বলে গণ্য করতে হবে। রাষ্ট্র একটি উপযোগিতামূলক সংস্থায় পর্যবসিত এবং একটি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দাসে পরিণত হয়েছে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতা হব্‌সের মতবাদকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবাত্মক মতবাদে উন্নীত করেছে।

গুরুত্ব

সার্বভৌমিকতা ও তার প্রকৃতি (Sovereignty and its Nature)

হব্‌সের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা

Scanned with CamScanner